সিরাতু আসমা'ঈন নবী

দারস-৫

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম গঠনপ্রণালিতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মহান আল্লাহ বলেন– "নি:সন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ–তার জন্য যে আল্লাহ ও আখিরাতকে কামনা করে থাকে এবং আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে।" (সূরা-আহযাব, আয়াত নং–২১)

আল্লাহ সুবুহানাহু ওয়া তায়ালার সুন্নাহ হলো তিনি তাঁর নবিদের অত্যন্ত নিখুঁত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য সহযোগে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন যাতে মানবজাতি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ না পায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক নবিকেই সুন্দরতর বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকার চরিত্র দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং সকল নবী–রসূলগণ ছিলেন সুদর্শন ও সচ্চরিত্র। আমরা জানি, হজরত ইউসুফ (আ) দেখতে খুবই সুদর্শন ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁর সৌন্দর্য পুরো মানবজাতির সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধেক। আবার কিছু কিছু স্কলারের মতে আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন জগতের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ, তাই এখানে ইউসুফ (আ) অর্ধেক সৌন্দর্য্যের অধিকারী বলতে প্রকৃতপক্ষে তিনি মুহাম্মদ (সঃ) এর সৌন্দর্য্যের অর্ধেক পেয়েছিলেন বলেই বুঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা হজরত মুহাম্মদের (সা) শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবরণ জানতে পারি। এর মধ্যে অন্যতম সুন্দর একটি বর্ণনা ইমাম বুখারী কিতাবুল মানাকিবে এনেছেন যা এরকম- তিনি মারা যাওয়ার পর রুবাইয়া বিনতে মুয়াওইয নামের এক সাহাবিয়াকে তার ছেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "নবিজি (সা) দেখতে কেমন ছিলেন?" রুবাইয়া জবাব দিয়েছিল, "হে আমার পুত্র! তুমি যদি তাঁকে দেখো তবে তোমার মনে হবে তিনি যেন এক উদিয়মান সূর্য।" ফলে একদিকে রুবাইয়া তাঁর উপমা দিচ্ছেন উদিত সূর্য দিয়ে, অন্যদিকে, কাব ইবনে মালিক নামের অন্য এক সাহাবি তাকে একটি পূর্ণিমার চাঁদ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন এভাবে– "যখনই নবীজি (সা) খুশী হতেন, তখনই তাঁর মুখ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো আলোকিত হয়ে উঠতো।" একজন বলছেন তিনি উদিত সূর্যের মতো, আর একজন বলছেন তিনি পূর্ণিমার চাঁদের মতো! এখানে লক্ষ্যনীয় যে, সাহাবিরা যা কিছুকে সুন্দর বলে বিবেচনা করতেন তার সাথেই তারা তাদের প্রিয় নবির (সা) তুলনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমার সবচেয়ে প্রিয় বর্ণনা হলো আমর ইবনুল আসের (রা) মুখ নিঃসৃত সাক্ষ্য। আমর ইবনুল আস প্রাথমিক সময়ে ইসলামের শত্রুদের একজন ডাকসাইটে নেতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। আবু সুফিয়ান, খালেদ বিন ওয়ালিদের মত তিনিও প্রথমে ইসলাম অস্বীকারকারী নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এই ধরণের নেতারা ছিলেন ইসলামের বিরুদ্ধে ভদ্র শত্রুদের অন্তর্ভূক্ত, তারা আবু জেহেল বা আবু লাহাবের মতো চরমপন্থী শত্রু ছিলেন না। তারা ইসলাম অস্বীকার করেছিলেন বটে কিন্তু ইসলামের

বিরুদ্ধে উগ্রতার পথ গ্রহণ করেন নি। আর কুদরতী ব্যাপার হলো এই মনোভাবের মানুষগুলোকে আল্লাহ্ পরবর্তীতে ইসলামের হেদায়েত দান করেছিলেন। সুতরাং ইসলামের শত্রুদের মধ্যে দুইটি ক্যাটাগরি ছিলো। একদল ছিলো যাদের অন্তর ছিল নম্র, আরেকদল ছিলো যাদের ছিলো সিলগালা করে দেয়া অন্তর। তাই নম্র অন্তরের অধিকারীদেরকে আল্লাহ্ ইসলামের আলো দান করেছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তাদের অন্তরে কল্যাণের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন।

আমর মাত্র কয়েক বছরের জন্য সাহাবি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার জীবদ্দশায় তিনি বলতেন, "নবিজির মুখের দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে পৃথিবীতে মধুর আর কিছুই নেই। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবার তৃষ্ণা কখনই মিটবার নয়। তারপরও যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে নবিজি (সা) দেখতে কেমন ছিলেন, আমি তার উত্তর দিতে পারব না। তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে থাকলেও এক স্বশ্রদ্ধ ভয়ের কারণে তা করতে পারতাম না, সব সময় মাথা নিচু করে থাকতাম।" মূলত রাসূলুল্লাহর মধ্যে এতোটাই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলো যে তাঁর সৌন্দর্য্যও সমীহের সাথে দেখতে হতো। এ ছিলো দুইটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ। একটি হলো তাঁর আকর্ষণীয় রূপ, অপরটি হলো তাঁর প্রভাবনীয় ভাবগাম্ভীর্য।

তবে মহানবি মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বর্ণনার বেশিরভাগই এসেছে তুলনামূলকভাবে নবীন ও বয়োকনিষ্ঠ সাহাবিদের কাছ থেকে। কেননা তাদের মধ্যে বড়দের মতো আবেগ ও সমীহভাব আসার মতো বয়স তখনোও হয়নি। আনাস ইবনে মালিক (রা) মাত্র সাত বছর বয়সে

নবিজির (সা) সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাকে তাঁর মা রাসূলুল্লাহর খেদমতে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি সারাদিন তাঁর সেবা-যত্নে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। টুকিটাকি কাজে সাহায্য করতেন। রাতে বাড়ি ফিরে যেতেন। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন এই আনাস বিন মালিক। বর্ণনাটি এসেছে শামায়েলে তিরমিযিতে। তার ভাষায়, "রসুল (সা) এতটা লম্বা ছিলেন না যে তাঁকে সবার মধ্যে আলাদাভাবে চোখে পড়বে। তিনি খুব বেশি ফর্সাও যেমন ছিলেন না, আবার তেমনি গাড় বাদামী বর্ণেরও ছিলেন না। [এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা সাদা রং বলতে হালকা বাদামী রংকে বুঝায়। সুতরাং তিনি হালকা বাদামী রঙের ছিলেন বলেই মনে হয়।] নবিজির (সা) চুলগুলো কোকড়ানোও ছিল না, আবার সোজাও ছিল না। আমি তাঁর হাতের মতো মোলায়েম কোনো মখমল বা রেশম জীবনে কখনও দেখিনি। এমনকি আমি তাঁর ঘামের গন্ধের চেয়ে সুগন্ধযুক্ত কোন পারফিউমও কখনও পাইনি।" এবং প্রসিদ্ধ আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ঘুমাতেন তখন উম্মে সালামাহ তাঁর ঘাম সংগ্রহ করতেন সুগন্ধি ও ঔষধি হিসেবে। তাঁর ঘাম সাহাবিরা পানির সাথে মিশিয়ে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

আল-বারা ইবনে আজিব নবিজিকে (সা) এভাবে বর্ণনা করেছেন, "নবিজি (সা) মাঝারি গড়নের ছিলেন, এবং তাঁর কাঁধ ছিল প্রশস্ত। তাঁর চুল ও দাড়ি ছিল খুবই ঘন। উনি চুল কানের পাশের 'জুলফি' পর্যন্ত বড় করে রাখতেন।" তিনি আরো বলেন- আমি রাসূলুল্লাহকে লাল চাদরে আবৃত দেখেছি, সেই রাতে আমি তাঁর চেয়ে অনিন্দ্যসুন্দর বস্তু আমার জীবনে আর কিছু দেখিনি।

আলি ইবনে আবি তালিব, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই, জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় তারা একসাথে কাটিয়েছেন, পাশাপাশি আলী ছিলেন তাঁর মেয়ের জামাই। এক কথায় তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি বর্ণনা করেছেন, "নবিজির (সা) মুখাবয়ব তেমন মাংসল ছিল না এবং গোলাকারও ছিল না, বরং কিছুটা ডিম্বাকৃতির ছিল। তাঁর ত্বক ছিল হালকা বাদামি, চোখ ছিল বড় এবং চোখের পাপড়িগুলো ছিল বেশ বড় বড় ও কালো। তাঁর কাঁধের পেছনের দিকটি ছিল প্রশস্ত। তাঁর সারা শরীরে তেমন একটা লোম ছিল না, তবে বুক থেকে নাভি পর্যন্ত সূক্ষ্ম একটা লোমরেখা ছিল। তিনি একটু দ্রুতগতিতে হাটতেন, দেখে মনে হতো যেন তিনি কোনো ঢালু পথ দিয়ে হাঁটছেন। কোনো কিছু ঘুরে দেখতে গেলে তিনি শুধু তাঁর মুখ না, পুরো শরীরটাকে নিয়েই ঘুরতেন।

সুবহানাল্লাহ, বর্তমান সময়ের বিশেষজ্ঞরাও আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আমরা যখন কারো সাথে কথা বলতে উদ্যত হই তখন যেন তাঁর দিকে শুধু মুখ না ঘুরিয়ে তাঁর দিকে পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকে এটেনশন দিয়ে কথা বলি। এটাই রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে ১৪০০ বছর পূর্বে করে দেখিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে আপনি যতগুলো পাবলিক লেকচার প্রদানের আদাবকেতা নিয়ে বই পুস্তক পাবেন, দেখবেন সেখানে যতকিছু বলা হয়েছে তাঁর সবগুলিই আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনে প্র্যাক্টিক্যালী দেখতে পাই। লেকচার দেয়ার টেকনিকের সবকিছুই ছিলো তাঁর নিখুঁত।

তাঁর দুই কাঁধের মাঝে ছিল নবুওয়তের সীলমোহর। নবুওতের এই চিহ্ন দিয়েই তাকে চেনা যাবে। আলী (রা) বলছেন– তাঁর দেহে ছিলো নবুয়তের মোহর, আর তিনি নিজেও ছিলেন নবুয়তের সর্বশেষ মোহর। এটি ছিলো মূলত তার কাঁধের শোল্ডার ব্লেডের মাঝে একটু অতিরিক্ত কিছু লোম, যার রঙ স্বাভাবিক রঙের চেয়ে একটু আলাদা। আকৃতি ছিলো

কবুতরের ডিমের মতো দেখতে প্রায়। বিখ্যাত সাহাবি সালমান আল-ফারিসি (রা) এই চিহ্ন দেখেই তাঁর নবুওতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁর খৃষ্টান গুরু তাকে বলেছিলো, শেষ নবীর দুই কাঁধের মাঝখানে এ রকম একটি খতমে নবুয়ত থাকবে। সালমান ফারসী প্রথমদিন এসে শেষ নবীর কিছু আলামত সম্পর্কে যাচাই করলেন, এবং বাসায় ফিরে গেলেন, পরবর্তী দিনেও তিনি এসে আরেকটি পরীক্ষা করলেন। এই দুইটি ছিলো বৈষয়িক চিহ্ন বা প্রমান। তৃতীয়দিন তিনি এসে রাসূলুল্লাহর মোহর পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কিভাবে তিনি তা করবেন? তিনি ভাবছিলেন কিভাবে যে আমি তাঁর কাঁধের পেছন দিকটা দেখি!! তিনি রাসূলুল্লাহর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন এই আশায় যে হয়তো তিনি তাঁর চাদর কোনো কারনে একটু সরালেই আমি দেখে নিতে পারবো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাপারটি টের পেয়ে নিজে থেকেই আস্তে করে আলগোছে তাঁর চাদরের পিছন দিকটি আলগা করে দিলেন। এবং মোহরটি দেখার সুযোগ করে দিলেন কোনো রকমের বাংচিত ছাড়াই। এভাবেই সালমান ফারসি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যা আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত জানবো। আলী (রা) আরো বলেনঃ যে-ই নবিজিকে (সা) হঠাৎ করে দেখত, সে-ই সমীহ জাগানো বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। আর যেই তাঁর সাথী হয়ে যেতো তাকে ভালো না বেসে পারতো না। এবং আর সবার মতো করে আলীও স্বাক্ষ্য দিয়ে বলছেন যে- আমি আমার জীবনে তাঁর আগে কিংবা পরে তাঁর মতো দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে এটাই রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে সকল সাহাবীর মন্তব্য ছিলো।

আরো একটি চমৎকার বর্ণনা হলো- জাবির ইবনে সামুরা (রা) নামের এক সাহাবি একদিন মধ্যরাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেটি ছিল পূর্ণিমার রাত।

জোছনায় ভরে ছিলো চারপাশ। পথিমধ্যে তিনি নবিজিকে (সা) দেখতে পেলেন। তাঁর পরনে ছিলো লাল চাদর। জাবিরের (রা) ভাষায়, "আমি একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, আর একবার পুর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালাম। আমার চোখে তাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হয়েছিল।" রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ্ শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্যই দেন নি। বরং তাঁর চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যও ছিলো অবিসংবাদিত।

অনেক মানুষ মহানবি মুহাম্মদকে (সা) কেবল সামনাসামনি দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন মদিনার ইহুদিদের প্রধান রাব্বি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম। তিনি ছিলেন মদীনার ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। হিজরতের সময় নবিজি (সা) যেদিন মদিনাতে প্রবেশ করেন, সেদিনই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রথম জানতে পারেন যে এই ব্যাক্তিটি নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করেছে। তিনি নবিজির (সা) কাছে গিয়ে সরাসরি বিষয়টি জানতে চান। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাদের সাক্ষাতের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, যা বুখারীতে এসেছে– "আমি তাকে দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম যে এটি কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।" প্রথম দর্শনেই শুধুমাত্র নবিজির (সা) চেহারা দেখেই সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

দৈহিক সৌন্দর্য এবং কাঠামো:

এক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয়, আবু কারসানার মা এবং খালা আবু কারাসানার সঙ্গে রাসূল (সা.) এর কাছে বায়াতের জন্য আসেন। অতঃপর ফিরে যাওয়ার পথে তারা বললেন, 'আমরা এমন সুদর্শন মানুষ আর

দেখিনি। আমরা তাঁর মুখ থেকে আলো বিকীর্ণ হতে দেখেছি।' (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ১/২৫৫)।

ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই হজরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারছেন। যদিও রাসূল (সা.) এর পবিত্র সৌন্দর্যের যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব। তাইতো ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি স্বরূপে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হতেন, তাহলে তাঁকে অবলোকন করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হত না। (খাসায়েলে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – মুফতি সুলাইমান)।

উচ্চতা:

হজরত আলী (রা.) ও হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) রাসূল (সা.) এর দেহাবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাসূল (সা.) অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার অতি বেটেও ছিলেন না। তবে মাঝারি গড়নের লোকদের মত ছিলেন। (বোখারী শরীফ: ১/৫০২)।

রাসূল (সা.) ছিলেন মাঝারি গড়নের। এত বেঁটে ছিলেন না যে, গণনার বাইরে। আবার এত লম্বাও ছিলেন না যে, দৃষ্টি কটু। যেন দু'টি ডালার মধ্যে তৃতীয় একটি ডালা, যা তিনটি ডালার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চমৎকার ও দৃষ্টিনন্দন। (যাদুল মা'আদ:৫৪)।

মুখ ও মুখমণ্ডল মোবারক:

হজরত বারা ইবনে আযেব (রা.)- কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কি তলোয়ারের মতো ছিল? তিনি বললেন, না বরং তাঁর চেহারা ছিল চাঁদের মতো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা ছিল গোলাকার। (সহীহ বোখারী : ১/৫০২, সহীহ মুসলিম ২/২৫৯)।

রবি বিনতে মোয়াওয়েয (রা.) বলেন, তোমরা যদি রাসূল (সা.)-কে দেখতে, তখন মনে হতো যে, যেন উদিত সূর্যকে দেখছ। (মোসনাদে দারেমী, মেশকাত ২/৫১৭)।

জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ প্রশস্ত ছিল। (সিরাতে মুহাম্মদে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব কাসেমী)।

দাঁত মোবারক:

হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বলেন, তিনি মুফালি জুল আস্নান অর্থাৎ দন্ত মোবারক চিকন ছিল এবং এর মধ্যে সামনের দাঁতগুলোর মাঝে একটু ফাঁক ছিল। শুভ্রতার ব্যাপারে অন্যস্থানে বলেন, মুচকি হাসির সময় তাঁর দাঁত মোবারক শিলাখন্ডের ন্যায় সাদা চকচক করে উঠত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলি পৃথক পৃথক ছিল। অর্থাৎ মাঝে ফাঁক ছিল, ঘন ছিল না। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন এই দাঁত মোবারক হতে যেন নূর ঠিকরে পড়ত। (মেশকাত শরীফ ২য় খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠা)।

চোখ, নাক ও গাল মোবারক:

হযরত আলী রা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ কালো এবং লম্বা পলক ছিল।

নাক মোবারকের বর্ণনা দিতে গিয়ে হিন্দ ইবনে আবী হালা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলের নাক খানিকটা উঁচু , তার উপর জ্যোতির্ময় চমক। আর এ জন্য প্রথম দৃষ্টিতে বড় মনে হয়। গাল ছিল হালকা ও সমতল এবং নিচের দিকে একটু মাংসাল। (সিরাতে মুহাম্মদে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব কাসেমী)।

ঘাড়, কাঁধ ও বুক মোবারক:

তাঁর ঘাড় মোবারক অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর ঘাড় মোবারক এত সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল, যেমন কোনো ভাস্কর্যের গর্দান। (শামায়েলে তিরমিযী)।

হজরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়স্কন্ধের হাড়সমূহ বড়সড় ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫২ পৃষ্ঠা)।

পেট মোবারক:

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি পেট ও বক্ষের সমতল স্থুল দেহের অধিকারী ছিলেন। মেদভুড়ি সম্পন্ন ছিলেন না। (শামায়েলে তিরমিযী)।

এমনিভাবে উম্মে মা'বাদ খাযাঈয়া (রা.) যিনি তার স্বামীর নিকট রাসূল (সা.) এর দৈহিক বিবরণ দিচ্ছিলেন, তিনি বলেন, তার মধ্যে মেদভুড়ির ত্রুটি ছিল না, বরং তাঁর দেহ মোবারক সারা জাহানের সৌন্দর্যের দীপ্তি ছড়ানো এক অপূর্ব ছবি ছিল। অর্থাৎ কোনো অপূর্ণতা ও ত্রুটি ছিল না যে, দেখতে অসুন্দর দেখাবে।

হস্ত মোবারক:

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) বলেন, নবী কারিম (সা.) এর হস্তদ্বয় প্রশস্ত, গোশতে পরিপূর্ণ ও নরম ছিল। হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) বলেন, প্রিয় নবী (সা.) এর আঙ্গুলসমূহ একই ধরনের লম্বা ছিল। অর্থাৎ অন্য লোকদের তুলনায় একটু লম্বা ধরনের ছিল।

হ্যাঁ, তবে সীমাতিরিক্ত লম্বা ছিল না যে, অসুন্দর দেখা যায় এবং আঙ্গুলের জোড়া শক্ত ও বড় ছিল। হজরত আলী ও হিন্দ ইবনে আবি হালা (রা.) উভয়ের বর্ণনা যে, তার জোড়ার হাড় মোটাসোটা ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)।

পা মোবারক:

হিন্দ ইবনে আবি হালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) এর পায়ের তলা খানিকটা গর্ত ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)।

প্রিয় নবী (সা.) এর দেহাবয়বের বর্ণনায় আছে তাঁর পায়ের তলা খালি ছিল। (আর-রাহীকুল মাখতুম ৭৫২ পৃষ্ঠা)।

রাসূল (সা.) এর পায়ের আঙ্গুলসমূহ সমানভাবে অন্যদের তুলনায় একটু লম্বা ছিল। যেমনটা আঙ্গুলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণ:

বর্ণ বলতে মূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের রং বোঝানো হয়েছে। বর্ণের ব্যাপারে অনেক বর্ণনা এসেছে যেমন:

হজরত আবু তোফায়েল বলেন, তিনি ছিলেন গৌর রং-এর, চেহারা ছিল মোলায়েম। তাঁর উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের। (সহিহ মুসলিম: ২/২৫৮)।

হজরত আনার (রা.) বলেন, তিনি আযহারুল লাউন তথা লালিমা মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের অধিকারী ছিলেন। (বোখারী শরীফ: ১/৫০২)।

হজরত আলী (রা.) বলেন, তিনি সুন্দর গোলাপি বর্ণের ছিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি এত সুন্দর, নান্দনিক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন যেন তাঁর পবিত্র দেহখানা পূর্ণিমার চন্দ্র দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। (শামায়েলে তিরমিযী)।

চামড়া:

রাসূল (সা.) এর শরীরের চামড়া রেশম থেকেও অধিক মসৃণ ও নরম ছিল। (সিরাতে ইবনে হিশাম-পৃ. ৪৯, বিশ্বনবী পরিচয়-পৃ. ৭৮)।

দাড়ি ও গোঁফ:

দাড়ি রাখা প্রত্যেক নবীর সুন্নাত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দাড়ি রাখতেন। মূলত তাঁর দাঁড়ি এত ঘন ছিল যে, পবিত্র বক্ষ ঢেকে যেত। (উসওয়ায়ে রাসূল, শা. তি.)।

গোঁফের ব্যাপারে বলতে গেলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ মোবারক কেটে খুব ছোট করে রাখতেন।

রাসূল (সা.) এর যুগে অগ্নিপূজকেরা গোঁফ লম্বা করে রাখত। আর দাড়ি খাটো করে রাখত। অথচ এটা ফিতরাত তথা নবীগণের অভ্যাস ও স্বভাব পরিপন্থী ছিল। এ জন্যই নবী (সা.) অগ্নিপূজকদের বিপরীত করার হুকুম দিলেন।

ঘাম:

রাসূল (সা.) এর শরীরে ঘাম হলে ঘামের বিন্দুগুলো মতির মতো চমকাত। তাঁর ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। (সিরাতে ইবনে হিশাম-পৃ. ৪৯, বিশ্বনবী পরিচয়-পৃ. ৭৮)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পশম ও চুল মোবারক:

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কম বেশি সবার পশম থাকে, তবে রাসূল (সা.) এর কেমন ছিল সেটা আমাদের জানার বিষয়। সেটা জানার আগে তাঁর মাথা মোবারকের চুল সম্পর্কে খানিকটা জেনে নিই।

হজরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক একেবারে সোজাও নয়, খুব বেশি কোঁকড়ানোও নয়।

হজরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ঘন, কখনো কখনো কানের লতি পর্যন্ত লম্বা। কখনো ঘাড় পর্যন্ত।

হজরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবী (সা.) এর দেহ মোবারকে স্বাভাবিকতার অধিক পশম ছিল না। কোনো কোনো লোকের দেহে প্রচুর পশম হয়ে থাকে।

রাসূল (সা.) এর দেহ মোবারকের কোনো কোনো অংশে পশম ছিল। আবার কোনো কোনো অংশ একেবারে পশমশূন্য ছিল। পবিত্র দেহের যে সকল স্থানে পশম ছিল, বিভিন্ন বর্ণনামতে সে স্থানসমূহ হলো–

বাহুদ্বয়।

উভয় পায়ের নলী।

উভয় স্কন্ধ।

বক্ষের উপরাংশ।

কন্ঠনালী হতে নাভি পর্যন্ত একটি সূক্ষ্ম রেখার মত ছিল।

প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর বক্ষের উপরি অংশে পশমও ছিল। তবে উভয় স্তন পশম শূন্য ছিল। (শামায়েলে তিরমিযী)।

মোহর:

দুই কাঁধের মধ্যস্থলে কবুতরের ডিমসদৃশ একটু উঁচু মাংস খণ্ড ছিল। এটাই মোহরে নবুয়াত। এতে লিখা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' মোহরের ওপর তিলক ও পশম ছিল এবং রং ছিল ঈসৎ লাল। (সিরাতে ইবনে হিশাম-পৃ. ৪৯, বিশ্বনবী পরিচয়-পৃ. ৭৮)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কতিপয় চরিত্রের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো :

(১) তাকওয়া ও আল্লাহভীতি :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে বেশী তাকওয়া অবলম্বনকারী ছিলেন। তিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী

ভয় করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিশেষ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে) বলেন : "আল্লাহ সম্পর্কে আমি তাদের চেয়ে বেশী অবগত এবং আল্লাহকে আমি তাদের চেয়ে বেশী ভয় করি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৭৫০)

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। তিনি আমলে সালেহ বেশী আদায় করতেন। হযরত আশিয়া (রা.) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেন : "নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ছিল ধারাবাহিক। তিনি যা পারতেন, তোমাদের কেউ কি তা পারবে? তিনি সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলতাম তিনি-এর ধারাবাহিকতা আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার তিনি সিয়াম পালন বাদ দিতেন এমন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। তুমি তাঁকে রাত্রে নামাযরত অবস্থায় দেখতে না চাইলেও নামাযরত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি তাঁকে রাত্রে ঘুমন্তাবস্থায় দেখতে না চাইলেও ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাবে।" (জামি তিরমিযী, হাদীস নং-৭০০)

হযরত আউফ বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একরাতে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি মিসওয়াক করলেন। অত:পর উজু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায আরম্ভ করলেন। আমিও তার সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি সূরাহ বাকারা পড়া শুরু করলেন। তিনি রহমত সংক্রান্ত আয়াত এলেই থামলেন আর তা আল্লাহর

নিকট চাইলেন এবং আজাব সম্পর্কিত আয়াত এলেই থামলেন আর তা থেকে পানাহ চাইলেন। অত:পর দাঁড়ানোর পরিমাণ রুকুতে অবস্থান করলেন এবং দু'আ পড়লেন। অত:পর সিজদা করলেন এবং অনুরূপ দু'আ পড়লেন। এরপর (পরবর্তী রাক'আতে) সূরাহ আলে ইমরান পড়লেন। অত:পর একেকটি সূরাহ পড়লেন থেমে থেমে।" (সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-১১২০)

হযরত আশিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন, দাঁড়িয়ে আদায় করতেন, এমনকি তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আপনি এমন করছেন, অথচ আপনার পূর্বের ও পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? জওয়াবে তিনি বললেন, "হে আয়েশা! আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" (মুসনাদে আহমাদ, হা. : ২৩৭০০)

(২) দানশীলতা ও বদান্যতা :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতা, উদারতা ও বদান্যতায় ছিলেন সর্বোচ্চ উদাহরণ। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি 'না বলতেন না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৩১১)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি দিয়ে দিতেন।

একবার উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে নবিজি (সা) তাঁর ছোট্ট কামরায় শুয়ে আছেন। তিনি কামরার ভেতরে গিয়ে দেখলেন যে, সেখানে খেজুর গাছের শাখা দিয়ে তৈরি একটি ছোট বিছানা ও একটি পানির জগ ছাড়া আর কিছুই নেই। সাধারণত আমরা বিছানায় প্রথমে তোশক ব্যবহার করি যা গাছের ছাল বা দড়ি দিয়ে তৈরি হয়, এর উপর আমরা আবার মেট্রেস বিছাই যা তুলা বা নরম কিছু দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর শুধুমাত্র তোশক ছিলো তাও আবার খেজুর ডালের। উমর (রা) কামরার ভেতরে এলে নবিজি (সা) তাকে বসতে দিলেন। তাঁর গায়ে খেজুর শাখাগুলোর কারণে সৃষ্ট রক্তাভ ক্ষত দেখে উমর (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। ঘটনাটা এমন এক সময়ের যখন নবিজি (সা) আরব ভূখন্ডের এক বিরাট অংশের অবিসংবাদিত নেতা। উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে এইভাবে জীবন কাটাতে দিতে পারি না। দেখুন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাটরা কীভাবে আরাম-আয়েসের মধ্যে জীবন-যাপন করে। নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরও ভালোভাবে জীবন কাটানোটা আপনার প্রাপ্য।" জবাবে নবিজি (সা) বললেন, "হে উমর! তুমি কি এতে খুশি নও যে তাদের আছে এই পৃথিবীর ক্ষনস্থায়ী জীবন, আর আমাদের আছে পরকালের (আখেরাতের) অনন্ত জীবন।"

হজরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম তিরমিযি এনেছেন তাঁর কিতাবে। "নবিজি (সা) যে বিছানায় ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার উপরের অংশ দিয়ে তৈরি যা আমরা খেজুরের পাতা দিয়ে কিছুটা নরম করে রাখতাম।" বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর কোনো একজন স্ত্রী তাকে আরেকটু আরাম দেওয়ার জন্য বিছানার (অর্থাৎ গদি/তোষকের) নিজের

অংশটুকু ভাঁজ করে নবিজির (সা) দিকে দিয়ে রেখেছিলেন। তাতে করে তিনি সেই রাতে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে ঘুমিয়েছিলেন, এবং ফলে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য সময়মত জাগতে পারেননি। যখন নবিজি (সা) জেগে উঠে বুঝতে পারলেন যে কী ঘটেছিল, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, সেই আরাম তিনি চান না যা তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে বাধা দেয়।

আয়েশা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ সাধারণত জীবিকা নির্বাহ করতেন দুইটি কালো বস্তু দ্বারা- খেজুর ও পানি। বলাই বাহুল্য আজকের মতো সেই সময় এতো বিলাসবহুল ফিল্টারিং সিস্টেমের পানী ছিলো না যে তা ঝকঝকে সাদা হবে। তাই স্বভাবতই তখনকার পানি দেখতে কালো বর্ণের ছিলো। কখনো কখনো তিনি ছয় সপ্তাহ সময় ধরে মাংস খেতেন না!

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) যিনি মদীনায় এসেছিলেন গায়ের চাদরটি নিয়ে মাত্র, তাকে তাঁর এক আনসারী ভাই বলেছিলো- এই যে দেখো এসব আমার সম্পদ, এ থেকে সবকিছুই অর্ধেক তোমার। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন, এসব তোমার কাছেই রাখো। আমাকে শুধু বলে দাও যে বাজারটা কোনদিকে। তাঁর কাছে কিছু পনির ছিলো। এই পনির থেকে বেচাবিক্রি করতে করতে তিনি একদিন মদীনার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের একজনে পরিণত হলেন। দেখুন, মদীনার ধনকুবেরদের একজন যিনি মদীনায় এসেছিলেন গায়ের কাপড়টি নিয়ে। পরবর্তীতে যখন মদীনায় সুখের সময় ছেয়ে গেলো, প্রত্যেকেই সাদা মোলায়েম রুটি খেতে আরম্ভ করলো তা দেখে তিনি বলেছিলেন, "নবিজি (সা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনও সাদা রুটি খান নি! এমনকি তাঁর পরিবারও সেই সময় মাংস খেতো না!"

আরেক বর্ণনায় আছে, নবিজির (সা) মৃত্যুর অনেক বছর পর যখন মুসলিম সমাজে সচ্ছলতা এসেছে, তখন অনেকেই হজরত আয়েশাকে (রা) মাঝে মাঝে ভালো খাবার উপহার হিসেবে পাঠাতেন। সেগুলো দেখে উনি খুশি না হয়ে বরং কাঁদতেন। কখনো কখনো মানুষজন তাকে অন্য কিছু উপহারও পাঠাতো। তিনিও আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা) মতো বলেছেন, "আল্লাহর রসুল (সা) কখনই পেট পুরে শক্ত রুটি খেতেন না।"

সাহাবিরা মদিনাতে শুরুর দিকে আর্থিকভাবে খুব কঠিন সময় অতিবাহিত করছিল। তিরমিযির বর্ণনায় এসেছে, সেই সময়ে একবার হজরত উমর (রা) রাস্তায় হাটার সময় নবি করিমকে (সা) বসে থাকতে দেখলেন। বাইরে ছিল মধ্যাহ্নের প্রচন্ড গরম। ওরকম সময়ে কেউ রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে না। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি এ সময় বাইরে কী করছেন?" নবিজিও (সা) বুঝতে পেরেছিলেন উমর (রা) কী কারণে বাইরে ছিলেন; আর তা হলো বাড়িতে খাবার নেই বলে। তাই তিনি বললেন, "তুমি যে কারণে বাইরে রয়েছ আমিও সে কারণেই।" তার মানে হলো এই যে, দুজনের বাড়িতেই কোনো খাবার নেই। তখন তারা দুজনেই বসে পড়লেন। এমন সময় দেখা গেল, হজরত আবু বকরও (রা) তাদের মতো ওই একই কারণে রাস্তায় হাঁটছেন। এবার তারা তিনজন বসে ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করছিলেন। এমন সময় একজন সাহাবি সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে তারা সেখানে কি করছেন। উমর (রা) জানালেন যে তারা ক্ষুধার্ত হয়ে বাইরে বসে আছেন। তখন সাহাবিটি তাদের তিনজনকে খাওয়াবেন বলে বাড়িতে নিমন্ত্রন করে নিয়ে এলেন। সাহাবিটির একটি ছাগল ছিল।

তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, “আমাদের এই ছাগলটিকে জবাই করতে হবে! আমরা অতিথিদের মাংস ও রুটি খাওয়াব!” অতঃপর তারা তিনজন মাংস-রুটি দিয়ে খাওয়া শেষ করার পর আল্লাহর রসুল (সা) আবু বকর (রা) এবং উমরকে (রা) স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা কিন্তু তাদের বাসা থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়েছিলেন, এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের এই খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। নবিজি (সা) আবু বকর (রা) এবং উমরকে (রা) পবিত্র কোরান থেকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন:

সুম্মা লাসুআলুন্না ইওয়ামা...

“তারপর সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আরাম-উপভোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।” [সুরা তাকাসুর, ১০২:৮]

দেখুন, এই একটু ভালো খাবারের পর রাসূলুল্লাহর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো! অথচ আমরা দৈনিক তিন চারবেলা পেটপুরে আহার করার পরেও আল্লাহর শুকরিয়া ও স্মরণ করিনা। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ কতই না সচেতন ছিলেন।

নবি করিম (সা) প্রায়শই গাধার ওপর চড়তেন। যদিও তাঁর একটি উট ছিল, তবুও তিনি গাধার ওপরে চড়তে কোনও প্রকার অসুবিধা বা খারাপ বোধ করতেন না। বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় উপস্থিত ৩১৩ জন যোদ্ধাদের মধ্যে ৭৫টি উট ভাগ করে দিতে হয়েছিল। অতএব মোটামুটিভাবে প্রতি ৩-৪ জনের জন্য একটি করে উট ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার পথে নবিজি (সা) আলি ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবু লুবাবাকে (রা) নিজের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। যাত্রাপথের সঙ্গী দুই সাহাবি বললেন, “আমাদের বয়স কম। আমরা নিজেরা সহজেই হেটে যেতে

পারি। আপনি উটের পিঠে উঠুন।” নবিজি (সা) শুধু যে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন পুরো যুদ্ধক্ষেত্রের কমান্ডার বা নেতা। সে হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নবিজি (সা) সঙ্গীদের দেওয়া প্রস্তাবটি গ্রহন করতে পারতেন। তিনি তাদেরকে এও বলতে পারতেন, “চল, আমরা উটটিকে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করি।” বরং তিনি হেসে বললেন, “তোমাদের দুজনের কেউই আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও, এবং পরকালের জন্য আমারও আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার প্রয়োজন তোমাদের দুজনের চেয়ে কোনও অংশে কম না। অতএব আমরা উটটিকে ভাগাভাগি করেই ব্যবহার করব।” সুবহানাল্লাহ।

আর রাসূলুল্লাহর কল্যাণকামীতা সম্পর্কে জানতে চান?

হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ১১০ বছর অবধি বেচেছিলেন। সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ৩০ বছর। আনাসের শৈশবে তার মা তাকে আল্লাহর রসুলের (সা) কাছে তাঁর খেদমত করার জন্য নিয়ে গেলেন, এবং পুত্রের জন্য দোয়া চাইলেন। রসুল (সা) দোয়া করেছিলেন, “হে আল্লাহ! তাকে তার হায়াতে, তার ধন-সম্পদে এবং তার বংশে বরকত দিন।” জানা যায় যে, পরবর্তীতে আনাস অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি যে ব্যবসাতেই হাত দিতেন তার সবকিছুতেই সমৃদ্ধি আসতো। মানুষজন তাঁর সাথে ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে চাইতো, কারণ তারা জানতো আনাসের সম্পদ ও ব্যবসার সাথে রাসূলের বরকতের দোয়া জড়িয়ে আছে। আনাসের বংশধরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তিনি নিজেও তাদেরকে গুণে রাখতে পারতেন না। আর এ সবই হয়েছিল আল্লাহর রসুলের (সা) বিশেষ দোয়ার কারণে।

আনাস (রা) বলেছেন, "আমি নবিজিকে (সা) দশ বছর ধরে সেবা করেছি। কিন্তু এর মধ্যে একবারও তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি, একবারের জন্যও তার মুখ থেকে 'উহ' শব্দটি বের হয়নি। একবারও তিনি আমাকে বলেননি 'তুমি এটা কেন করনি'?" এমনই শিষ্টাচারী ছিলেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা)। তাঁর পক্ষ থেকে নূন্যতম বিরক্তিও প্রকাশ পায় নি। আমরা জানি, একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ধারণা রাখে তাঁর আপন পরিবারবর্গ। যার সাথে যার উঠাবসা বেশি সেই ভালো বলতে পারে। আর আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর খেদমত করেছেন দশ বছর লাগাতার। কিন্তু তিনি এই দশ বছরে একবারো রাসূলুল্লাহর মুখে উফ শব্দটি শুনেননি। তিনি আরো বলেন- আমাকে একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি বের হয়ে কাজের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে খেলায় মশগুল হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ অনেক্ষণ পর উৎকন্ঠিত হয়ে আনাসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখলেন আনাস বাচ্চাদের সাথে খেলছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহও (সঃ) দেখা গেলো আনাসসহ বাকি বাচ্চাদের সাথে খেলায় মেতে উঠেছেন।

এই কারণেই বলছি যে, ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে একমাত্র তাঁর কাছের মানুষ ও পরিবারের লোকেরাই ভালো বলতে পারে। একবার কিছু ইহুদি এসে রাসূলুল্লাহকে বললো- আসসামু আলাইকুম, যার অর্থ হলো- তোমার উপর মৃত্যু বর্ষিত হোক। রাসূলুল্লাহ কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়েই উত্তর দিলেন- ওয়া আলাইকুম, অর্থাৎ তোমাদের উপরেও... এদিকে ইহুদিদের কথাবার্তা শুনে ঘরের ভিতরে থাকা আয়েশা (রা) মোটেও চুপ করে থাকতে পারলেন না। রাগান্বিত হয়ে বলে উঠলেন- তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কিভাবে তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এমন আচরণ

করার সাহস দেখাতে পারলে! রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন- ও আয়েশা, শান্ত হও। তুমি কি জাননা বিনয় হলো সবচেয়ে সুন্দরতম আচরণ, আর সবকিছুকে একমাত্র বিনয় দিয়ে সুন্দর করা যায়, আর অভদ্রতা সবকিছুকেই বিশ্রী করে দেয়। এরপর যখন ইহুদিরা চলে গেলো তখন আয়েশা (রা) বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তাদের এমন ঔদ্ধত্য দেখেও কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন!! রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন- তুমি কি আমার উত্তর খেয়াল করোনি? আমি তো তাদের অভিশাপকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। ঘটনাটি প্রমাণ করে কিভাবে তিনি পরিস্থিতি সামলে নিতেন ভদ্রতা ও বিনয়ের মাধ্যমে।

তাঁর সাহসিকতা নিয়ে আলি ইবনে আবি তালিব (রা) বর্ণনা করেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করতো তখন আমরা নবিজির (সাঃ) কাছে আশ্রয় নিতাম।" আনাস ইবনে মালিকের (রা) বর্ণনা অনুসারে একবার মদিনাবাসীরা মধ্যরাতে উচ্চস্বরে হৈ-হুল্লোড় শুনতে পেয়ে খুব ভয় পেয়েছিল। তারা তখন সাবধানের সাথে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন দেখতে পেল যে নবিজি (সা) ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। রহস্য উদঘাটনের জন্য নবিজি (সা) একাই এগিয়ে গেলেন। একটু এগিয়ে তিনি সেখানে আবু তালহার ঘোড়াটিকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি স্যাডল বা জিন ছাড়াই ঘোড়াটির উপর চড়ে ফিরে এলেন। এটাই প্রকৃত পৌরষ ও সাহসিকতা। তিনি ফিরে এসে সবাইকে বললেন, "তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি এটি পরীক্ষা করে দেখেছি।"

নবি মুহাম্মদ (সা) ছিলেন একজন উদার এবং খোলা মনের মানুষ। তাঁর কাছে কেউ কোনও অনুরোধ করলে তিনি কখনো তা ফেলতে পারতেন না। এমনকি ছোট বাচ্চারাও যে কোন কারণে নবিজির (সা) কাছে সহজেই যেতে পারত। পিচ্চি পিচ্চি বাচ্চারা তাঁর কাছে এসে এটা ওটা করে দেয়ার জন্য বায়না ধরতো। একবার নবিজি (সা) এমন একটি কাপড় পরা ছিলেন যার কিছু অংশ ছেড়া ছিল। এটি দেখতে পেয়ে একজন সাহাবি তাঁকে খুব সুন্দর একটা পোশাক উপহার দিল। সেটি দেখে অন্য এক সাহাবি নবিজিকে (সা) বলল, "আপনি কি আমাকে এই পোশাকটা উপহার হিসেবে দিতে পারেন?" নবিজি (সা) সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলেন, এবং ঘরে ফিরে আবার আগের সেই ছেড়া পোশাকটা পরে বের হয়ে এলেন! এরপর যখন তিনি ঘরে ফিরে গেলেন তখন বাকি সাহাবীরা ঐ সাহাবীকে ঘিরে ধরলো, এবং বলল- কিভাবে তুমি এটা করতে পারলে! তুমি জানোই যে তিনি কখনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন না, কিভাবে তুমি ঐ পোশাকটি চেয়ে বসলে। ওই সাহাবী উত্তর দিলো- আমি আসলে চেয়েছি রাসূলুল্লাহর গায়ে লাগা সেই পোশাকটি আমার কাফন হোক।

নবি করিমের (সা) রসবোধ ছিল তুখোড়। তাঁর রসিকতার অনেক উদাহরণ রয়েছে। রসিকতাগুলো ছিল খাঁটি ও নির্মল। সেগুলোর মধ্যে সামান্যতম মিথ্যাচার থাকতো না। একবার এক বৃদ্ধা নবিজির (সা) কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রসুল! দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" নবিজি (সা) একথা শুনে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার খালা! আপনি কি জানেন না যে বুড়ো মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না?" একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলো। তখন তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, "আপনি কাঁদবেন না। আল্লাহর কসম, বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ

করতে পারে না। তবে আল্লাহ তায়ালা প্রথমে আপনাকে একটি সুন্দরী যুবতী নারীতে পরিণত করবেন, এবং তারপরে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন!"

নবিজি (সা) মৃত্যুশয্যায় থাকার সময়ে তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা) একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং প্রচন্ড মাথাব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি তখন তাকে শান্ত করার জন্য কিছুটা রসিকতা করে বললেন, "ও আয়েশা! যদি তুমি এই মুহুর্তে মারা যাও তবে তুমি কী হারাবে? যে ব্যক্তি তোমাকে গোসল করাবে এবং তোমার জানাজা পড়াবে সে হবো আমি।" আয়েশা (রা) অনুযোগের সুরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি নিশ্চিত যে আপনি এটি চান, কারণ তখন আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে স্বাধীনভাবে যেতে পারবেন!" সুবহানআল্লাহ। নবিজি (সা) নিজের মৃত্যুশয্যায়ও রসিকতা করেছেন। এই ঘটনা থেকেই ফিকহ বা ধর্মীয় বিধান এসেছে যে স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যকে জানাজার জন্য গোসল করাতে পারবে।

যাহের নামে একজন যুবক ছিল। সে ছিল বেশ সরল ও আন্তরিক প্রকৃতির। নবি করিম (সা) ছেলেটিকে খুব পছন্দ করতেন। একবার তিনি ছেলেটিকে বাজারে কিছু জিনিস বিক্রি করতে দেখলেন। ছেলেটি একটা জিনিস দেখিয়ে বলছিল, "কে এই আমার কাছ থেকে এটা কিনবে? কে আমার কাছ থেকে এটা কিনবে?" নবিজি (সা) নিঃশব্দে পিছন থেকে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। যাহের যখন টের পেল যে নবিজি (সা) তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, তখন সে বরকত আশায় পিছন দিকে হেলান দিল। সাথে সাথে নবিজি (সা) অনেকটা রসিকতা করে কিছুটা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,

“আমার কাছ থেকে এই ‘আবদ’ কে কিনবে?” সেই দিনগুলোতে কেউ যদি বাজারে বলে যে সে ‘আবদ’ বিক্রি করতে চাচ্ছে, তার অর্থ সবাই বুঝবে যে ওটা গোলাম। এই রসিকতাতে নবিজি (সা) কিন্তু মিথ্যা কিছু বলছেন না। এখানে ‘আবদ’ অর্থে তিনি ‘আল্লাহর বান্দা’ বুঝাতে চেয়েছেন। জহির বলল, “হে আল্লাহর রসুল! সেক্ষেত্রে আপনি খুব কম দাম পেতে যাচ্ছেন। আমি খুব বেশি দামে বিক্রি হবো না।” নবিজি (সা) জবাবে বললেন, “তুমি আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে অত্যন্ত দামি।”

নিজের উম্মতদের প্রতি নবিজির (সা) ছিল অপরিসীম ভালবাসা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে উল্লেখ করেছেন:

লাকাদ জাআকুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম...

“তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রসুল এসেছে। তোমাদের দূর্ভোগ তার কাছে দুঃসহ। সে তোমাদের জন্য চিন্তা করে, মুমিনদের জন্য তিনি দয়াময় ও অত্যন্ত দরদি।” [সুরা তওবা, ৯:১২৮]

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একবার নবি করিম (সা) পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। সেখানে একটি আয়াতে হজরত ইব্রাহিম (আ) বলছেন, “হে আল্লাহ! যে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমারই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আমার অমান্য করে, তবে আপনি ক্ষমাকারী।” এরপর নবিজি (সা) সুরা মায়েদার একটি আয়াত পাঠ করলেন যেখানে হজরত ইসা (আ) বলছেন, “হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে সেটা আপনার অধিকারের মধ্যেই পড়ে, আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে

আপনি ‘আজিজুল হাকিম’।” [এখানে ইসা (আ) মনে মনে চাচ্ছিলেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করেন।]

ওই দুই আয়াত পড়া শেষ করে আমাদের প্রিয় নবি (সা) তাঁর নিজের উম্মতদের কথা ভাবতে ভাবতে আল্লাহর পানে হাত তুলে বললেন, “হে আল্লাহ, আমার উম্মত! হে আল্লাহ, আমার উম্মত!” তারপর তিনি নিজের উম্মতদের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা তখন ফেরেশতা জিব্রাইলকে (আ) বললেন, “মুহাম্মদের এর কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর কেন সে কাঁদছে?” (অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কান্নার কারণ আগে থেকেই জানতেন।)

জিব্রাইল (আ) নবি করিমের (সা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কাঁদছেন কেন?” জবাবে নবিজি (সা) জবাব দিলেন, “আমি আমার উম্মতের কথা মনে করে, এবং তাদের পরিণতি কি হবে তা ভেবে কাঁদছি।” তারপর জিব্রাইল (আ) আল্লাহর কাছে ফিরে তা জানালে আল্লাহ বললেন, “হে জিব্রাইল! আবার তুমি মুহাম্মদের কাছে ফিরে যাও, এবং তাকে গিয়ে বলো যে তাঁর উম্মতদের ব্যাপারে আমি তাঁকে খুশি করব।” অন্য কথায়, আল্লাহ তায়ালা নবিজির (সা) উম্মতদের বিশেষ বরকত দেবেন, কারণ তিনি তাঁর প্রিয় নবিকে খুশি করতে চান।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবিকে একটি করে ‘ইচ্ছা’ (বা কবুল হওয়া দোয়া করার সুযোগ) দান করেছেন যা তিনি (আল্লাহ) প্রত্যাখ্যান করবেন না। কোনো কোনো নবি এই ইচ্ছাটিকে তাদের সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার কারণে

হতাশ হয়ে সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হজরত নুহ (আ) ৯৫০ বছর ধরে দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষরা তাঁর কথা শুনছিল না তখন তিনি বিফল মনোরথে প্রতিপালকের কাছে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি চাই না যে এই পৃথিবীতে কাফেরদের একটিও ঘর অবশিষ্ট থাকুক।" নুহের (আ) ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ছাড়া সব মানুষকে ধ্বংস করেছিলেন।

হজরত ইব্রাহিম (আ) সেই বিখ্যাত দোয়াটি করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার বংশধরদের মধ্য একজন থেকে রসুল প্রেরণ করুন.....।" এবং এ কারণেই নবি মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, "আমি আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফসল।" হজরত মুসা (আ) ফেরাউনের বিরুদ্ধে যে দোয়াটি করেছিলেন, আল্লাহ তা রেখেছিলেন। হজরত সুলায়মান (আ) দোয়া করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন রাজত্ব (নিয়ন্ত্রণ) দিন যা আপনি এর আগে অন্য কোন মানুষকে দেননি।" সুতরাং আল্লাহ তাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন যা আর কাউকেই দেওয়া হয়নি (উদাহরণস্বরূপ, শয়তান ও জিনের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি)।

আর আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদের (সা) জন্য নির্ধারিত দোয়াটি তিনি আমাদের (অর্থাৎ তাঁর উম্মতদের) জন্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর কথায়, "প্রতিটি নবি ও রসূলকে আল্লাহ তায়ালা একটি করে দোয়ার সুযোগ দিয়েছেন যা তিনি (আল্লাহ) কখনই প্রত্যাখ্যান করেন না। আমি ব্যতীত প্রত্যেক নবি-রসুলই তাদের দোয়াগুলো এই দুনিয়াতে ব্যবহার করেছেন।

আর আমি আমার দোয়াকে আমার উম্মতদের জন্য সংরক্ষণ করেছি। আমি দোয়াটি তাদের (আমার উম্মতদের) জন্য শেষ বিচারের দিনে ব্যবহার করবো। আমার দোয়া হবে, 'হে আল্লাহ! আমার সব উম্মতদের ক্ষমা করুন'।" আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করবেন। প্রত্যেক মুসলিম যারা নবিজির (সা) শিক্ষা কিছুটা হলেও গ্রহন করবে এবং সেই অনুসারে আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই যে নবিজি (সা) আমাদের জন্য তাঁর দোয়াটি সংরক্ষণ করলেন, উম্মতদের জন্য এর চেয়ে বড় ভালোবাসার প্রমাণ আর কীই বা হতে পারে!